

হারুন-অর-রশিদ ▽

বিজ্ঞান শিক্ষায় নারী

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিজ্ঞান শিক্ষায় অংশগ্রহণে বাংলাদেশের নারীরা সমতা অর্জন করেছে। তবে নারীরা প্রকৌশল ও গবেষণায় পিছিয়ে আছে। আবার কৃষি ও চিকিৎসায়, স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণায় দুনিয়াজুড়ে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও এ দুটি ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশের নারীরা। এমনকি বিশ্বজুড়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কিছু ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা ও হার পুরুষকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তবে পিএইচডি স্তরে ও উচ্চতর গবেষণায় নারী-পুরুষের সমতার এ চিত্র যেন বৈষম্যের রূপ নেয়। পিএইচডি স্তরে এসে নারীর অংশগ্রহণ আচমকা কমে যায় এবং উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে এ বৈষম্য আরো প্রকট আকার ধারণ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বের মোট গবেষকের ৭২ শতাংশ পুরুষ এবং নারী মাত্র ২৮ শতাংশ। বাংলাদেশের মোট গবেষকের মাত্র ১৭ শতাংশ নারী। আসলে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো উচ্চতর পর্যায়ে চর্চা ও গবেষণার বিষয়। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পর মেয়েদের বিয়ে হয়। ঘরসংসার সামলানো, সন্তান প্রতিপালনসহ নানা গুরুদায়িত্ব নারীকে প্রায় একাই বহন করতে হয়। ফলে তাদের পক্ষে উচ্চতর পর্যায়ে গবেষণা করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে কৃষি (৩১.১ শতাংশ) এবং চিকিৎসা ও সেবার (৩৩.৩ শতাংশ) ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে এ দুটি খাতে নারীর অংশগ্রহণ ৩০ শতাংশের কিছু বেশি। সম্প্রতি ফ্রান্সের প্যারিস থেকে 'সারোস রিপোর্ট : টুওয়ার্ডস ২০৩০'

শীর্ষক ইউনেস্কোর ওই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষায় নারী-পুরুষের অনুপাতে সমতা এলেও মোট শিক্ষার্থীর কথা বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, এ দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে। ছোট একটি পরিসংখ্যান দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিল মোট শিক্ষার্থীর ১৭ শতাংশ আর ২০১৩ সালে যা দাঁড়িয়েছে ১১ শতাংশ। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ২২ শতাংশ। আর এ বরাদ্দ কমতে কমতে চলতি অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১১.৬ শতাংশ। অথচ ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা খাতে একটি দেশের বরাদ্দ হওয়া উচিত নিজ দেশের জিডিপি ৬ শতাংশ অথবা বাজেটের ২০ শতাংশ। যেখানে সারা বিশ্বে শিক্ষা বাজেট বাড়ছে, সেখানে আমাদের দেশে তা ক্রমাগত কমেছে কেন? আর্থিক উন্নতি বা সামাজিক সূচকে উন্নতির মাধ্যমে জীবনযাপনে স্বচ্ছন্দ আসবে, যা পাওয়া সবার অধিকার এবং কাম্য। তবে এটাই যে মানবজীবনের মোক্ষ নয়, তা বোঝাবে কে? মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের তালিকায় শীর্ষেই থাকুক—এটাই চাওয়া। কিন্তু তাকে ভারসাম্য দিতে হবে সমাজে নিরন্তর জ্ঞানচর্চার তাগিদ জিইয়ে রাখার মাধ্যমেই। বিজ্ঞান শিক্ষায় বাংলাদেশের নারীদের সমতা অর্জন নিঃসন্দেহে এক বড় অগ্রগতি। নারীর ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে এ সমতা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে

বলে আশা করা যায়। যুগে যুগে তাদের মেধা ও শ্রমশক্তিকে সমাজ ও দেশ গঠনে সম্পৃক্ত করা হয়নি। বাংলাদেশে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৭২ সালে। এ বছর সরকারি চাকরিতে ১০ শতাংশ কোটা নারীর জন্য সংরক্ষণ করার বিধান চালু করা হয়। ১৯৭৩ সালে দুইজন নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আজ বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশেই নারীরা নেতৃত্ব দিচ্ছে। তারা শিক্ষাজীবনে অসাধারণ সাফল্য প্রদর্শন করছে এবং উচ্চশিক্ষা লাভ করে শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী ইত্যাদি মননশীল পেশায় অসামান্য অবদান রাখছে। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারী জাগরণের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'তোমাদের কন্যাগুলোকে শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও, নিজেরাই নিজেদের অমের সন্ধান করুক।' তাঁর আহ্বানে আজ শতভাগ সাদা মিলছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে নারীর বিশেষ ভূমিকা চোখে পড়ার মতো। বাংলাদেশের পোশাকশিল্প টিকে আছে নারী শ্রমিকদের ওপর ভর করে। শত অবদান সত্ত্বেও নারীরা সমাজে নানাবিধে অর্থাৎ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা বাংলাদেশের নারীদের এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞান শিক্ষায় সমতা সামাজিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা থেকে নারীদের মুক্তি দেবে বলে আশা করা যায়।

লেখক : শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
h_o_rashid@yahoo.com